Touch

অনুভব

DESI SENIOR CENTER
JAMAICA, QUEENS

May 19, 2017

WRITING WORKSHOP GENEROUSLY FUNDED BY POETS & WRITERS

Those authors designated with a * are workshop participants

After two and a half years as Director of the Desi Senior Center, I am constantly amazed at our seniors' talents and spirits. Each day our seniors inspire me to do more for them and grow as a person. This past year has marked many expansions and improvements in our programs: we offer computer classes, assistance for benefits and entitlements, conducted a small needs assessment, and most creatively a writing workshop.

Generously funded by the Poets & Writers Workshop, the eight week writing workshop with our seniors was led by noted Bangladeshi American writer Ashwak Fardoush. In the workshop, a core group of ten seniors were able to constructively channel their creativity and produce well written pieces about their lives and experiences. These writings have inspired others who are not in the workshop to also contribute written pieces to this collection.

This collection is a written testimony to our seniors' creativity and talents. They wrote about everything from our senior center to the mother language movement to their experiences coming to the United States. These works are powerful reminders of memories from Bangladesh and immigration.

I am happy that our seniors have the opportunity to express themselves creatively. Contrary to widely held beliefs, as we enter our golden years, we are still capable of doing many things. We are able to produce beautiful works and contribute substantively to our communities and society. Our seniors are living testimony of this. They are not stagnating but in fact thriving more than ever before.

I am grateful for the support of Poets and Writers Workshop for funding the eight week workshop at our center. We look forward to continued collaborations in the future.

Best regards,
Dilafroz Nargis Ahmed
Program Director
Desi Senior Center
India Home, Inc.

বয়োজেষ্ঠ্য কেন্দ্র

ছালেমা খাতুন*

ইংরেজীতে বাহারী নাম সিনিয়র সেন্টার
দিন ক্ষণ মাস পেরিয়ে বছর পূর্ণ হলো তার।
জানা অজানা ভাইবোনেরা জানিনা সবার নাম
সবাইকে জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও সালাম।
ইন্ডিয়াহোম ও যাদের আপ্রাণ চেষ্টায় হয়েছে সেন্টার
তাদের সকলের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা ভার।

পরিচালনার দায়িত্ব পালনে যিনি অতি চমৎকার
সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে কিছু ভলানটিয়ার।
জ্ঞানী ও গুনীজনরা সুস্থ্য ও সুন্দর জীবনের দেন নানা পরামর্শ
ব্যায়াম ও সঠিক নিয়ম কানুন মানলে জীবন হবে আদর্শ।
আনন্দ ভ্রমন ও বিভিন্ন সময় হয় নানা অনুষ্ঠান
লাইব্রেরী থেকে বই পড়ে বাড়াই মন ও জ্ঞানের মান।

সেন্টারটির উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি করি কামনা
পরোয়ারদেগার সহায় হলে পূর্ণ হবে বাসনা।

Assalamu Alaikum

My name is Maimoon Mohamed. I am from Guyana and live with my family around the corner on 169th Street for nearly 25 years.

My husband and I started coming to the Desi Senior Center here at Jamaica Muslim Center (JMC) since 2014. About 90 sisters and brothers meet from 9:00 in the morning until after zuhr.

We start the day with a very nice breakfast. We then do exercise or share our stories with friends. Sometimes, doctors will visit us and give good advice on many health problems and how to stay healthy. We sometimes get talks on how to understand and use computers.

All of us have lunch by midday. We eat and enjoy the dessert and then pray zuhr.

At first, I felt like a stranger but very quickly I found that I have so many nice and kind friends. We love and care so much for each other.

Sister Nargis is a very nice, loving, and kind sister. I feel happy when she is around us.

The Desi Senior Center at JMC is a blessing to all of us. Most of us are alone at home during the week with no one to talk to until the afternoon. We feel happy and loved and meet so many friends from Bangladesh who are all nice and loving.

My dua is for Allah to bless all of us with good health, long life, and happiness. Ameen.

Maimoon Mohamed

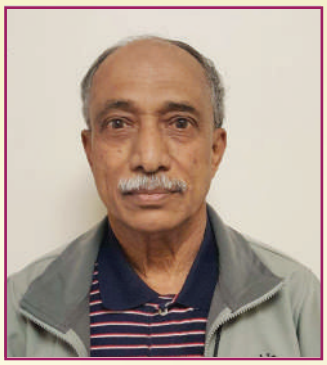

আমার চোখে দেশী সিনিয়র সেন্টার

মো: আবু তাহের (সদস্য) - দেশী সিনিয়র সেন্টার, জ্যামাইক্

বিসমিল্লা-হির-রাহমা-নির রাহীম

সত্তর বছর নিছক কম সময় নয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই কেন্দ্রের সদস্য হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই কেন্দ্রে এসে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে (নওয়াজ ভাই, কুতুবদিয়া/ চট্ট) তেঁতুলিয়া (মকবুল ভাই, নওঁগা/ রাজ) পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব এবং পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। কেন্দ্রটি সকলের মিলন ও পদচারনায় প্রাণবন্ত এবং আনন্দ উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠে।

কেন্দ্রের প্রতিটি ভাই বোন নিজ নিজ মেধা, শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য ও দেশের উন্নতির অবদান রেখেছেন। কেন্দ্রটিতে এসে দেখলাম বিশ্বের ক্ষমতাধর পরাশক্তি দেশটির জাতীসংঘের সদর দফদর কাচঁ দিয়ে ঘেরা দৃষ্টি নন্দন সূ উচ্চ ভবনটি, হার্ডসন নদীর তীরে অবস্থিত যার সম্মুখে ১৯২ টি দেশের পাতাকা পতঁপত করে উড়ে নিজেদের পরিচিতি জানাচ্ছে বিশ্বের মানুষদেরকে। নিউইয়র্ক বিশ্বের রাজধানী হিসাবে খ্যাত এবং স্যাংচুয়ারী সিটিও বটে। এ শহর কখনও ঘুমায় না। মেয়েদের জন্য ও নিরাপদ জায়গা। রাতে জীবনের কোন ঝুঁকি নিয়ে বাসায় ফিরতে হয়না তাদের। জীবিকার প্রয়োজনে ছেলেমেয়েরা বাসায় বয়স্কদের সময় দিতে পারে না বলে কেউ কেউ নিজেকে নি:সঙ্গ ও একা মনে করেন। দেশী সিনিয়র সেন্টারের সুবাদে এখন অনেকেই পেয়েছেন সময় কাটানোর জায়গা। শরীরটাকে সুস্থ্য, প্রশান্ত এবং উৎফুল্ল রাখার উপকরন। মনে হয় সবাই যেন একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য। সেন্টারের সেবা প্রদানকারী সদস্যদের মাঝে দেখেছি অভাবনীয় আন্তরিকতার ছোঁয়া। আর পান্না ও সাবিত অতুলনীয়।

এখানে রজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি শিক্ষা, মত বিনিময় এবং আনন্দ উল্লাসের মধ্যদিয়ে সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত কি করে যে সময় কেটে যায় বুঝতেই পারিনা। মাঝে মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত প্রবীন শিক্ষক জনাব মো: নুরুল ইসলাম (১৯৫৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ), জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, বন্ধুবর মতিন ভাই সহ অন্যান্য ভাই বোনেরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য রেখে ধৈর্য ও নিষ্টার সাথে তার সারমর্ম আলোকপাত করেন। যা সত্যিকার অর্থেই প্রশংসনীয়। মাঝে মধ্যে ইসমাইল ভাই বিভিন্ন সংস্থা থেকে খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরনের কাজটি সত্যিই উদারতার পরিচয় বহন করে।

সকাল ১০ টায় শুরু হয় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের বক্তব্য। ওনারা অন্ন, স্বাস্থ্য সেবা, আইনী পরিসেবা, চিকিৎসা, প্রশান্তি, আর্থিক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনা এবং দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ইংরেজী ভাষার শিক্ষক হিসাবে আছেন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পারদর্শীনী কবিতা আপা। যিনি বাগ্মীতা, বাচনভঙ্গী এবং নিজস্ব কলা কৌশল প্রয়োগে সকলকে মুগ্ধ করেন। গল্প এবং কবিতা লেখার প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন আশোয়াক ফেরদৌস। কম্পিউটার প্রশিক্ষনের জন্য আসেন উম্মে বকুল আপা। ব্যায়ম করানোর জন্য আসেন তরুন অভিজ্ঞ ফিজিও থেরাপিষ্ট ডকটর ইমরুল কবির। আরও আছেন জনাব মিলন ভাই। বিনোদনের জন্য আছে লূডু, কেরাম বোর্ড এবং ধাঁ - ধাঁ প্রতিযোগিতা। সঙ্গেঁ থাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা। আগ্রহীদের জন্য জন্মদিন পালনের সার্বিক ব্যবস্থা।

বেলা ১২ টায় পর নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে লাইনে দাঁড়িয়ে সবাই খাবার সংগ্রহ করেন। একাজে সেন্টারের আপারা সার্বিক সেবা দিয়ে থাকেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। যোহরের নামাজ শেষে মিষ্টি বিতরনের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শেষ হয়। উল্লেখ্য যে, মাঝে মধ্যে আলী ভাই, সিদ্দিক ভাই ও রাজ্জাক ভাইয়ের দরাজ গলায় পরিবেশিত ইসলামী গজল আমাদেরকে মুদ্ধ করে।

ম্যানহাটন, আনন্দ ভ্রমনে গিয়ে দেখেছি পৃথিবীর প্রথম সর্বোচ্চ ১০৪৬ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট ক্রাইস্লার বিল্ডিং। এরপর ২য় ১২৫ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট ১০২ তলা এ্যাম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং। যাহা ১৯৩০ সালে নির্মিত হয়েছিল। দেখেছি ১০৩ তলা ইচ্চতা বিশিষ্ট ফ্রিডম টাওয়ার। যার পূর্ব পরিচিতি ছিল 'বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' নামে আরও আছে বৃহত্তম গ্রান্ড সেন্ট্রাল রেল ষ্টেশন, প্রসপেক্ট পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, ব্যাটারী পার্ক, সাউথ ফেরী, সিটি হল, পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল, টাইম স্কয়ার, পেন ষ্টেশন, কলাম্বাস সার্কেল, সেন্ট্রাল পার্ক, রকফেলার বিল্ডিং, মিউজিয়াম অব ন্যাশনাল হিস্ট্রি, মিউজিয়াম অব আর্টস, মিউজিয়াম অব মাদার টু সাড, ব্রুকলীন ব্রীজ, বৃহত্তম ঝুলন্ত ভ্যারাজোনো ন্যারো ব্রীজ, লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি, কেন্দ্রিয় পোষ্ট অফিস, যা ২৪ ঘন্টা গ্রাহক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আরও দেখেছি হ্যারল্ড স্কয়ারে আকাশচুম্বী অট্টালিকার সারী সহ বৃহত্তম মেসিজ ষ্টোর।

এলিস আইল্যান্ড দেখেছি আকর্ষনীয় ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি। ১৮৭৬ সালে ফ্র্যান্স সরকার আমেরিকার শতবর্ষ স্বাধীনতা পূর্তি উপলক্ষে বন্ধুত্বের নিদর্শণ স্বরূপ মূর্তিটি উপহার দিয়েছিলেন। যেটি একহাতে ধারন করে আছে মহান সংবিধান ও অন্য হাতে ধরে আছে শান্তির মশাল। ষ্ট্যাচু অব লিবারটিতে লেখা আছে আমেরিকার কবি এমালাজারাসের ইংরেজী কবিতা। যার বাংলা অনুবাদ নিম্নরুপ :

'তোমার ক্লান্ত গরিব মানুষগুলোকে এনে দাও,
তারা জড়ো সড়ো হয়ে আছে,
তারা মুক্তির নি:শ্বাস ফেলতে চায়,
নদীর তীরের আবর্জনার মতোই যারা নিরাশ্রয়,
যারা ঝড় বাদলে ভেসে বেড়াচ্ছে,
তাদেরকে আমার কাছে এনে দাও।
সোনালী ভবিষ্যতের পাশে,
আমি আমার বাতি তাদের জন্য তুলে ধরছি।

উপরোল্লেখিত স্থাপনাগুলো দেখতে প্রতিদিন অগনিত পর্যটক ভীড় জমায়। সিনিয়র সেন্টারটির গুরু দায়িত্বে যিনি আছেন, তিনি আমাদের সবার প্রিয় স্বনামধন্য, দক্ষ অভিজ্ঞ, বাগ্মীতা পারদর্শী, নিষ্ঠাবতী এবং প্রজ্ঞাময়ী পরিচালিকা বিনয়ী নার্গিস আপা। যিনি প্রতি বছর ভর্তুকি দিয়ে আনন্দ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে আমাদের সবাইকে মুগ্ধ এবং বিমোহিত করেন। শুকুরিয়া জানাই মহান আল্লাহর দরবারে। যিনি আমাদের রব ও হেফাজতকারী।

দেশী সিনিয়র সেন্টার ও আমি

মোঃ মকবুল হোসেন *

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশ ভালই কাটছিল জীবনের পড়ন্ত বিকেলের দিনগুলো। শীতের সকালের মিষ্টি রোদের উত্তাপে শরীর গরম করার মতো ভাললাগা নিয়ে। জীবন মানেই অনিশ্চিত ভ্রমন এই নশ্বর পৃথিবীতে। বয়সের এই অবেলায় মা- মাটির সংস্পর্শের আবেদন ছেড়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমেরেকা এসেছি ইমিগ্রান্ট হয়ে। চলমান জীবন প্রবাহে ছন্দপতন ঘটলো। ভিন দেশ, নতুন পরিবেশ ও ভিন্ন ভাষার প্রতিকুলতাকে জয় করলাম মনের সহিষ্ণুতা দিয়ে। কিন্তু একাকিত্বের দহন জ্বালা থেকে পরিত্রান পেলাম না। সময়ের সমুদ্রে অবগাহন করেও কাউকে সামান্যতম সময় দেবার অবকাশ কারো কাছে নেই। সবাই যেনো যন্ত্র মানব। সেকারনে প্রতিনিয়ত স্মরণীয় দিনগুলোর পরিধি বাড়তে থাকলো। জীবনটা ব্যর্থতার আধারে ডুবে যেতে লাগলো। আল্লাহর ঘরে যাতায়াতের মধ্যদিয়ে পরিচয় ঘটলো জনাব আবু জাফর ও খান সাহেবের সঙ্গে। এই ব্যক্তিদ্বয়ের সৌজন্যে দেশী সিনিয়র সেন্টারের সঙ্গে সদস্য হিসাবে যুক্ত হলাম। পিছনের জীবনের মর্মপীড়া বহন করার কিছুটা অবসান হলো। তৃষিত মরুর বুকে মরুদ্যান খুঁজে পেলাম।

অনুভবে এলো। বাল্যকালের মত এখন বয়স্কদের পাঠশালায় এসেছি আরেকবার ছাত্র হয়ে। নব জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে কিছু জানতে ও শিখতে। যে স্কুলের দায়িত্বে আছেন প্রতিভাময়ী মহান শিক্ষিকা ও দায়িত্বশীল পরিচালিকা মিসেস নার্গিস ম্যাডাম। আমরা জানি যে, অধিকার ও কর্তব্য বোধ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আর প্রত্যেক সুযোগ সুবিধার মধ্যে থাকে নৈতিক বাধ্য বাধকতা। তাই বিবেকবান কোন মানুষই যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন না। আর করাটাও যুক্তি সঙ্গঁত নয়।

এই কেন্দ্রে এসে পেয়েছি টেনশান মুক্ত জীবন ব্যবস্থা। পেয়েছি কথা বলার পরিবেশ, বন্ধু বান্ধন, সময় কাটানোর উপকরণ। সপ্তাহের তিন দিন বসে বয়স্কদের মিলন মেলা। সকালের ব্রেকফাষ্ট দিয়ে শুরু হয় একটি দিনের। চলে পারস্পরিক সৌহাদ্য বিনিময়। আলাপ চারিতা, টেবিল ভিত্তিক আলোচনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকে স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সমসাময়িক বিষয় ভিত্তিক আলোচনা। তৃতীয় পর্যায়ে থাকে ব্যায়াম। পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে শেষ হয় দিনের কর্মসূচী।

দেশী সিনিয়র সেন্টারের সদস্যরা সবাই প্রবীণ। পেশা ভিত্তিক কাজের অভিজ্ঞতার চড়াই উৎরাই পেরিয়ে জীবনের এই সন্ধিক্ষণে এসে সবাই সমবেত হয়েছেন। ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থেকে কিছু জানতে ও শিখতে। সময়ের অগ্রগতি মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। তার দৃষ্টিকে করে প্রসারিত। মানুষকে চেনা যায় তার কাজের মূল্যায়ন দ্বারা। মানুষ মানুষের কল্যাণ করবে, সুপথ দেখাবে এটাই মানবতাবোধ। দেশী সিনিয়র কেন্দ্রে এসে পুনর্বার আমার দিব্যচোখে এসত্যটুকু ধরা পড়লো। মানবতা বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিনিয়রদের নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে, তাদের মনুষত্ব বোধের আদর্শকে জানাই লাল সালাম।

বয়স্কদের মিলন মেলা

মোঃ ইউনুছ খান

আসসালামুআলাইকুম, আমি মোহাম্মদ ইউনুছ খাঁন, এই Senior Centre এর একজন জুনিয়র সদস্য। গত মে মাসের ২৮ তারিখে জ্যামাইকায় এসে এই সেন্টারের সদস্য হয়ে আমার এত ভাল লাগছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন। এখানে এসে বাংলাদেশের আমার মত বয়:বৃদ্ধদের মিলন মেলা দেখে আমাকে মোহিত করল। এখানে সব বয়স্করা কিন্তু একরকম নয়। কেউ নীরবে আসে, নীরবে থাকে এবং নীরবে চলে যায়। কেউ স্বরবে আসে, স্বরবে এখানে সময়টা অতিবাহিত করে এবং যাবার সময়ও স্বরবে চলে যায়। সকাল ৯টা হতে দুপুর দেড়টা, সপ্তাহে ৩ দিন এখানে একটা উচ্ছাছের বন্যা বয়ে যায়। কি সাংসারিক, নিজের, আত্মীয়-স্বজন, দেশ সমাজ, ধর্মীয়, রাজনৈতিক সব ধরনের কথা বার্তা, বক্তব্য প্রকাশ পায়। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আলাপ কিছুটা তিক্ততার দিকে চলে যায়, তখনই কাছে বসে থাকা সদস্য তিক্ততাকে মিটিয়ে আনবার চেষ্টা চালান এবং সমর্থ হন। এখানে আমার সহ-সদস্য ভাই ও বোনেরা যে যার যার কাজে পারদর্শী ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। এখানে এই রকম সেন্টার আসে বলেই বয়স্করা ইউএসএ-র মত দেশে মোটামোটি ভাল ভাবেই আছেন এবং তাহাদের সময় অতিবাহিত করেন। যাহা আমরা বাংলাদেশে আশা করতে পারিনা।

এই সেন্টারের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলে আমি মনে করি। আমাদের সকলেরই এমন আচরণ করা উচিত হবে না, যাতে আমাদের এই সেন্টারের সম্মান হানি হয়। যেমন আমাদের সবাই একে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতিশীল হতে হবে, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হকে হবে। প্রত্যেকে একে অপরকে ভালবাসতে হবে। যাহা উপরে না দেখালেই চলবে। একে অপরকে সম্মান দিতে হবে তবেই আমরা একে অপরের সম্মানের পাত্র হব। আমরা যেন মিথ্যা কথা না বলি, অহংকার না করি, ধন-দৌলতের ও শিক্ষার বড়াই না করি, তবেই আমাদের মধ্যে সহানুভূতিশীল ও সৎভাব সম্পূর্ণ মনোভাব জন্মাবে ও তা কার্যকর হবে।

এতক্ষণ আমি যা বললাম, তা সম্পূর্ণ আমার নিজের থেকেই বললাম। এখানে উপদেশ দিবার মত আমার অধিকার সীমিত। তাই আশা করি এতে আপনারা কোন মন:ক্ষুন্ন হবেন না এবং আমাকে নিজ গুনে ক্ষমা করে দিবেন।

সবশেষে আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি- আমি আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ রোজ শনিবার আল্লাহ চাহেত বাংলাদেশে রওয়ানা হবো। বাংলাদেশে কতদিন থাকবো, আবার কখন আল্লাহতায়ালা ইউএসএ-তে আনবেন এবং আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মিলিত করবেন তা এক আল্লাহতায়ালাই জানেন।
এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি যদি আপনাদের কাউকে ও আমার কথা বার্তা ও আচরনের মাধ্যমে কোন দু:খ অথবা ব্যাথা দিয়ে থাকি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।
আশা করি আপনারা আপনাদের নিজ গুনে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আমার জন্য দোয়া করিবেন, যেন পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা আমাকে সুস্থ্য এবং ছহি ছালামতে রাখেন।

খোদা হাফেজ

বাংলা ভাষা আন্দোলনে কিছু কথা

যমুনা চক্রবর্তী

২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। কিছু কথা, সত্য ঘটনা, যা আমার নিজের মনে আছে।

১৯৫২ সাল। তখন আমি প্রথম শ্রেনীতে পড়ি ব্যাপ্টিষ্ট মিশন। গার্লস হাই স্কুল, বরিশাল। ৬-৭ বছর বয়স। ওখানে স্কুলের হোস্টেলেই থাকতাম। মেয়েদের স্কুলের পাশাপাশি ছেলেদের স্কুল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। হঠাৎ কিছু হট্টগোলের শব্দ শুনতে পেলাম। স্কুলের ছেলেরা কিছু কথা জোরে জোরে বলতে বলতে মেয়েদের স্কুলের দিকে আসছে। আমাদের স্কুলের বড় ক্লাশের মেয়েরা গেটের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেদের সাথে কথা হল। তারপরে ছেলে ও মেয়েদের সমন্বয়ে বলতে লাগলো বাংলা ভাষা চাই।

আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা। উর্দূ ভাষা চলবেনা, আমরা বাংলা ভাষা চাই। আমাদের দেশ বাংলাদেশ। একটানা অনেকটা সময় চলছিল সকলের এই শ্লোগান। হঠাৎ আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার আগমন সেখানে। তিনি খুব রাশভারী এবং নিয়মশৃঙ্খলা মানা, সরকারের আইন মানা কড়া মহিলা ছিলেন। তিনি শ্লোগানে নেতৃত্বদান কারী দুই ছাত্রীকে জোরে ধমক দিলেন। অনেক বাকবিতন্ডার পরে শ্লোগান থামলো। আস্তে আস্তে ছেলেরা তাদের স্কুলে ফিরে গেলো।

প্রধান শিক্ষিকা সবাইকে হলরুমে আসতে বল্লেন। আমরা সেখানে চুপুচাপ বসে আছে। তিনি সামনে এসে দাড়ালেন। সবাইকে একনজর দেখলেন। তারপর দশম শ্রেনীর দুই নেত্রী টগরদি ও মহুয়াদিকে সামনে ডাকলেন। ওরা সামনে এসে দাড়ালো। তারপর তিনি বলতে লাগলেন। মেয়েরা স্ট্রাইক মানে বোঝে? তখন প্রথম শ্রেনীর ছাত্রী। এ শব্দটি জীবনে প্রথম বারের মত শুনলাম। আমরা ছোটোরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি আর খুব ভয় পাচ্ছি। হঠাৎ তিনি একটা মাটির প্রদীপ হাতে নিলেন, সবাইকে দেখালেন। তারপর জোরে দেওয়ালে ছুড়ে মারলেন। প্রদীপটা ভেঙ্গে গেল। তিনি বলেন এটাকে বলে স্ট্রাইক। তোমরা নিয়মভাঙ্গার কাজ করেছো। তোমরা মেয়েরা বলো টগর ও মহুয়ার কথা শুনবো। আমরা বোধহয় সবাই একসাথে টগর মহুয়ার কথা শুনবনা একথা দশ পনেরোবার বলেছিলাম। টগরদি ও মহুয়াদির দিকে তাকিয়ে দেখি তাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। (মহুয়াদি- আমার স্বামীল বড় বোন)। অনেকক্ষন পরে বড় মেয়েরা ক্লাশে চলে গেলেন। আমরা ছোটরা বসে রইলাম। তিনি আমাদের দাঁড়াতে বললেন আমরা দাড়ালাম। বল্লেন তোমাদের একটা গান শিখাবো।

গানের প্রথম কলিটি আমার আজও মনে আছে -
‘লক্ষ কোটি কণ্ঠে জানাই তোমারে সালাম
কায়েদে আজম, কায়েদে আজম।’

এতো কিছু ঘটে গেল। তখনও কিছু বুঝিনি। তারপর দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল। বছরের পর বছর গেল। বড় হলাম। বুঝতে শিখলাম -আমার এই বাংলা ভাষার জন্য কত রক্ত বয়ে গেছে। বরকত, সালাম, রফিক এবং আরও কত ভাই এরা ভাষার জন্য শহীদ হয়েছে। যতটুকু মনে পড়ে কায়েদে আজম ছিলেন তখনকার পূর্ববাংলা ও পাকিস্তানের সর্বপ্রধান নেতা বা সর্বাধিকারী। তিনি বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণরুপে জলাঞ্জলি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। আমাদের বাংলাদেশের ভাষা সৈনিকরা বরকত, সালাম, রফিক এবং জব্বর মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিলেন। কখনও কি শুনেছেন সারা বিশ্বের আর কেউ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন? না, কখনও না। আজ বিশ্ব বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আমার মনে আছে আমরা জাতীয় সংগীত গাইতাম। পূর্ব বাংলা - শ্যামলিমায় .....
পদ্মনদীর তীরে অরুনিমায়....
তারপর হঠাৎ একটি দিন বদলে গেল জাতীয় সঙ্গীত। আমরা গাইলাম
'পাকসার জামীন সাদ বাদ
কিষওয়ারে জামীণ সাদ বাদ'

এতকিছুর পরেও শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি। যে বাংলা ভাষা নিয়ে আমরা জন্মেছি। হে আমার মাতৃভাষা বাংলা - আমি তোমায় ভালবাসি। এখনও প্রতি বছরে বাইমেলা বা পালা পার্বনে ২-১ টা বই কিনি। নিউইয়র্ক সিটিতে এখন কয়েকটি বাংলা উপাসনালয় আছে। তার একটিতে আমি এবং আমার পরিবার সবাই প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বাংলা ভাষাতে উপাসনা করি। নিজের ভাষায় গান, প্রার্থনা করতে এবং প্রভুর বাক্য শুনতে কত ভাল লাগে।

কয়েকদিন আগে আমার ছেলে নীলের গাড়ীতে বাড়ী ফিরছিলাম। গান হচ্ছিল আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। দীপ বল্ল মা শোনো। হঠাৎ শুনলাম আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের দ্বিতীয় লাই।
এবারে গান শুনতে মন দিলাম। একটি ছেলের গলায় গান হচ্ছে।
'আমি তোমাকে বলতে চাই
জাতীয় সংগীতের দ্বিতীয় লাইন। এর মানে কি, প্রথম লাইন যদি হয়-
'আমার সোনা বাংলা'
দ্বিতীয় লাইন - 'আমি তোমায় ভালবাসি'।

অর্থটা বুঝলাম, হাসলাম, মনে মনে তারিফ করলাম। মনের কথাটা বাংলায় প্রকাশ করেছে ওর মনের মানুষকে। আমার চারিপাশে আজ ছেলে মেয়েরা নাতি, নাতনীরা। আমাদের সবার বংশধরেরা আছে। ওদের সবাইকে একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা বলুন। ওরা বাংলা লিখতে না পারুক, পড়তে না পারুক অন্তত যেন বাংলা ভাষায় কিছু কথা বলতে পারে।
এই আমার আশা
আমার বাংলা ভাষা।

বাঙ্গালীর জাতিসত্বা ও ঐতিহ্য

হোসেন মোঃ মকবুল

পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ কে থাকতে চায়
পরাধীন জাতির কোন আত্ম সম্মান নাই।
বাঙ্গালীর জাতি সত্বা হাজার বছরের ঐতিহ্যে মহীয়ান
ইংরেজ দুই শতাব্দীর শাসনে ও করতে পারেনি ম্লান।
বৃটিশ শাসনের অবসানে জন্ম হয়েছিল পাকিস্তান
দ্বিজাতীয় ভাষা এর জাতি সত্বাকে করেছিল বিভ্রাট।
মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম লাভ সন্তান স্বাধীন ভাবেই
প্রকাশ করে স্বাধীনতা তার জন্মগত অধিকার।
মায়ের মুখের ভাষা বাংলার রাখতে মান,
বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছিল,
অজ্ঞাত সহ বরকত, রফিক, জব্বার, সালাম।
অকৃতজ্ঞ জাতি, ৮ই ফাল্গুনের শহীদদের রাখেনি মান,
আজও দেয়নি তাদের যোগ্য সম্মান।
২১শে ফেব্রুয়ারী পালনে ৮ই ফাল্গুন হয়েছে প্রত্যাখ্যান।
মায়ের ভাষা সবার সেরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে অনন্য
এই ভাষাতেই কথা বলে হয়েছি আমরা ধন্য।
যুগান্তরের সঞ্চিত কষ্টে ঘোষিত হয়েছিল অভিযান
ক্ষমতার দম্ভে দোসরদের সঙ্গে হেঁসেছিল পাকিস্তান।
দাসত্ব থেকে মুক্তির স্বাদে জাতি হয়ে দলবদ্ধ
শোষনকারীদের বিরুদ্ধে করেছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ।
অজস্র প্রাণের আত্মত্যাগে পেয়েছি জয়ের উল্লাস
বিশ্ব মানচিত্রে পেয়েছি স্থান বাংলাদেশের নাম।
আমরা দেশের সাহসী নাগরিক হতে জানি
আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রত্যাশী ও গণতন্ত্রকামী,
তৃষিত আত্মার জন্য চাই পরিসিদ্ধ পানি,
যা ধুয়ে দেবে অকল্যান ও গ্লানিদগ্ধ মনের কালিমা গুলি।
এসো হে নবীন, হে যুবা, অলসতা ঝেড়ে ফেলো,
লক্ষ স্থিরে উঠে দাড়াও জীবনের পথে।
সংগ্রামী জীবনে শক্তির সাধ যদি থাকে
বিজয়ের লক্ষে পৌঁছার গৌরবটুকু তাতেই পাবে।

গীবত বা পরনিন্দা

মুহম্মদ গোলাম মোস্তফা চৌধুরী *

পবিত্র কোরআনে গীবত সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেছেন।' তোমাদের মধ্যে কউ যেন পরস্পরের গীবতে লিপ্ত না হয়।। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা তা ঘৃণা করবে। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নি:সন্দেহে আল্লাহ পাক পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়'।

রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : 'গীবত যিনা বা অবৈধ যৌনাচারের চেয়েও ঘৃন্য ও জঘন্য পাপ। গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়েই সমান অপরাধী'।

গীবত এমন এক জঘন্যতম পাপ যা বরবাদ করে দেয় মানুষের ঈমান ও আমল। ধ্বংস করে দেয় দুনিয়া ও আখেরাত। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আজ আমরা এই জঘন্যতম কাজে সর্বদা আকণ্ঠ ডুবে আছি। ছোট বড় কাজে আমরা কেউই এ সর্বনাশা ব্যাধি থেকে মুক্ত নই। সমাজের সর্বস্তরে এ ব্যাধি এমন মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে যে, এটাকে এখন আর কোন পাপই মনে করে না। বিবেকের ঘটেছে অপমৃত্যু।

গীবত আরবী শব্দ। শরীয়তের পরিভাষায় গীবতের অর্থ হলো মুখে, কলমে ও ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন উপায়ে কারো অনুপস্থিতিতে কারো এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা যা শুনলে সে আঘাত পেতে পারে। আলোচিত ব্যক্তি মুসলমান হোক কিংবা কাফের হউক।

যদি এমন কোন দোষের কথা আলোচনা করা হয় বা আদৌ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে সেটা গীবত নয় - বরং তা হয় তোহমত বা অপবাদ, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা গীবতের চেয়েও জঘন্য অপরাধ। কেননা এখানে গীবতের সাথে মিথ্যা যোগ হচ্ছে।

কোন প্রয়োজনে একবার এক মহিলা ছাহাবী হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। উন্মুল মুমেনীন হয়রত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রয়োজন শেষে উক্ত মহিলা বিদায় নিলেন। মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন সরল চিত্তে বল্লেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ। মহিলাটা কি বেটে আকৃতির নয়? এ কথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ব্যতিত হয়ে বল্লেন, আয়েশা তুমি গীবত কেন করলে? আয়েশা রাযিয়া আল্লাহু আনহা অবাক হয়ে বল্লেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমিতো অসত্য কিছু বলিনি। আল্লাহর রসুল এরশাদ করলেন: আয়েশা, এটা ঠিক যে তুমি মিথ্যা বলোনি। কিন্তু তুমি উক্ত মহিলার অগোচরে তার শারীরিক খুঁত আলোচনা করেছো। এটাই গীবত।

একদিন উপস্থিত ছাহাবাদের উদ্দেশ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জিজ্ঞাসা সরলেন, তোমরা কি গীবতের অর্থ জানো? তাহারা আরজ করলেন, আল্লাহ ও তার রসুলই ভালো জানেন। এরশাদ হলো : নিজের ভাইয়ের এমন কোন দোষ আলোচনা সরার নাম গীবত যা শুনলে সে মনে আঘাত পেতে পারে। ছাহাবাগণ আরজ করলেন : ইয়া রাসুলা-ল্লাহ। সে ভাইয়ের মধ্যে আলোচিত দোষটি যদি সত্যি থেকে থাকে? এরশাদ হলো। যদি তুমি এমন কোন দোষের কথা বল, যা তার মধ্যে নেই তবে সেটাতো গীবত নয়। তোহমত বা অপবাদ। গীবত করা জীবিতের যেমন হারাম তেমনি মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করা, তাঁর দোষ চর্চায় লিপ্ত করোনা। তাদেরকে গালমন্দ করোনা বরং গুন আলোচনা কর। কেননা এখন তারা তাদের কর্মফল ভোগ করছে।

গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়ই সমান অপরাধী। যে মজলিসে গীবত ও দোষ চর্চা হচ্ছে, সে মসজিলে চুপচাপ বসে গীবত শ্রবণ করাটাও গীবতের সমতূল্য অপরাধ। হাদীস শরীফে আছে : তোমার উপস্থিতিতে যখন কারো দোষ চর্চা হয় তখন তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও এবং তার ভালো ভালো দিকগুলি তুলে ধর সম্ভব হলে গীবত বন্ধ করার চেস্টা করো। অন্যথায় সে মসলিশ বর্জন করো। কেননা চুপ থাকলে তুমিও গীবতকারী বলে গন্য হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন : গীবত থেকে বেঁচে থাকো। কেননা এতে তিনটি মহা ক্ষতি রয়েছে :
পথমত: গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না।
দ্বিতীয়ত: তার নেক আমল গ্রহন করা হয় না।
তৃতীয়ত: তার আমল নামায় বদ আমল বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জুলুমের বিরুদ্ধে সুবিচার লাভের উদ্দেশ্যে শাসকের কাছে অধীনস্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি শরীয়তে দিয়েছে। এটা গীবত রূপে গণ হবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থেকে জুলুম মেনে নিলে নিজের হকতো নষ্ট হবেই উপরন্তু জালেমকে প্রশ্রয় দেয়ার ফলে জুলুমও বৃদ্ধি পাবে। জালেমের বিরুদ্ধে কথা বলা, অভিযোগ তুলে ধরা, তদ্রুপ মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কোন ফাসেক ও পাপাসক্ত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করে দেয়া গীবতের পর্যায়ভূক্ত নয়। আল্লাহ পাক কারো দোষ প্রকাশ করে দেয়া পছন্দ করেন না। তবে মজলূমের জন্য সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরার অবকাশ রয়েছে। এটা গীবত রূপে গন্য হবে না। কাউকে যদি কোন দোষ বা পাপে লিপ্ত দেখা যায় তখন সে কথা এমন বক্তির নিকট প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে যারা দ্বারা উক্ত ব্যক্তির সংশোধনের হবে বলে আশা করা যায়। এখানে উক্ত ব্যক্তিকে হেয় করার উদ্দেশ্য নয় বরং হিতাকাংক্ষা বা কল্যাণ কামনাই মুখ্য। যেমন: সন্তানের কোন দোষ পিতা - মাতার কর্নগোচর আনা, ছাত্রের দোষ শিক্ষকের কাছে প্রকাশ করা কিংবা উৎকোচ গ্রহনের কথা শাসকের কাছে পৌছে দেয়া ইত্যাদি গীবত বলে গন্য হবে না।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল কোরআনের বানী

মোহাম্মদ আবু তাহের (সদস্য)
Desi Senior Center

১. আল কোরআন এমন এক গ্রন্থ যা আমি তোমাদের উপর পরিপূর্ণ সৌভাগ্যরূপে নাযিল করেছি। যাতে তোমরা এর আয়াত সমুহের উপর চিন্তা ভাবনা করতে পারো এবং বুদ্ধিমান লোকেরা অনুধাবন করতে পারে।

সুরা-ছোয়াদ ৩৮:২৯

২. তুমি এমন বিষয়ের অনুসরণ করো না যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, কর্ণ, চক্ষু ও মন-সহ প্রত্যেকটির ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সুরা-বণিইসরাইল ১৭:৩৬

৩. হে ঈমানদার লোকেরা! বহু ধারনা করা থেকে দূরে থাক, কেননা কোন কোন ধারনা পাপ জনক হয়ে থাকে। আর তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় খোঁজাখোঁজি করো না। একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে? (গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে।)

সুরা-হুজরাত ৪৯:১২

৪. মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে।

সুরা-আনফাল ৮:২

৫. আর স্মরণ করো তোমার রবকে মনে মনে, ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায়- সকাল ও সন্ধ্যায়।

সুরা-আরাফ ৭:২০৫

৬. তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

সুরা-বাকারা ৩:১৫২

৭. যারা সব সময় নিজেদের মাল ব্যয় করে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায়, যারা ক্রোধতে দমন করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। এসব নেককার লোকদেরকেই আল্লাহ খুব ভালবাসেন।

সুরা-আল ইমরান ৩:১৩৪

৮. হে ঈমানদাররা, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নামাজ নিঃসন্দেহে একটি শক্ত কাজ। কিন্তু সেই অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়। আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।

সুরা-আল ইমরান ২:৪৫

৯. তোমরা যদি কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহন কর, তা'হলে শুধু এতটুকুই নিবে যতখানি তোমার উপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারন কর তা'হলে নি:সন্দেহে ধৈর্যধারন কারীদের জন্য কল্যান রয়েছে।

সুরা-নাহল ১৬:১২৬

১০. প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে। আমি তোমাদের পরীক্ষা করি- মন্দ ও ভালো দিয়ে, অত:পর আমার কাছেই আসবে।

সুরা-আম্বিয়া ২১:৩৫

১১. উপদেশ মমিনদের জন্য উপকার। আমি জ্বীন ও মানুষকে কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

সুরা-যা-রিয়াত ৫১:৫৫

১২. আল্লাহ ভালবাসেন না অহংকারী ও দাম্ভিকদের।

সুরা-নিসা ৪: ৩৬

১৩. আমি যদি চাইতাম, তবে প্রত্যেক লোককে পথ প্রদর্শন করতাম, কিন্তু আমার কথা সত্য যে, জ্বীন ও মানুষ দ্বারা আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করব।

সুরা-সাজদাহ ৩২:১৩

১৪. হে মুহাম্মদ! বল, সমুদ্রগুলি যদি আমার রবের কথা সমূহ লিখার জন্য কালি হয়ে যায়; তা'হলে তা ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আমার রবের কথা লিখা শেষ হবে না; বরং এই সমুদ্র পরিমান কালি যদি আমরা আরো এনে দেই সাহায্যার্থে, তবে তাও যথেষ্ট হবে না। (এখানে আল্লাহ তায়ালার কথার অর্থ তাঁর কাজ, তাঁর কামালত, তাঁর পূর্ণতা সূচক গুন/বৈশিষ্ট্য, তাঁর শক্তি, মহিমা ও তাঁর জ্ঞান কৌশল)।

সুরা-আল কাহাফ ১৮:১০৯

মূল্যবান কিছু হাদীস সমূহ

মোহাম্মদ আবু তাহের (সদস্য)

১. হযতে আলকাসাইবনে ওয়াক্কাস লাইছী বলেন, আমি শুনেছি, ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) মসজিদে মিম্বরে উঠে বলেছিলেন, আমি রাসুলাল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সকল কাজই নিয়ত অনুয়ায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে, তাই পেয়ে থাকে। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভ বা কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হয়েছে, তার হিজরত তদোদ্দেশ্যেই হয়েছে।

(বোখারী শরীফ- হাদীস নং-১)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণীত। তিনি বলেন, নবী করিম (সা.) বলেছেন, এমন দু'টি বাক্য আছে যা দয়াময় আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। উচ্চারণ করতে অধিক সহজ। দাড়ি পাল্লার পরিমাপে বেশী ভারী। বাক্য দু'টি হল- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আজীম (অর্থাৎ মহা পবিত্র আল্লাহ, তিনি মহা মহিমান্বিত)।

(বোখারী শরীফ-শেষ হাদিস)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্নিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যার মুখ ও হাতথেকে মুসলমানরা নিরাপদ, সেই মুসলমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিবৃত্ত থাকে, সেই মুহাজির।

(বোখারী শরীফ- হাদিস নং-৯)

৪. হযরত যুহায়র ইবনে হারব (রা.) আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন তা হল : ১) তোমরা তারই এবাদত করবে, ধারন করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে সকল বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপচ্ছন্দ করেন : ১) বাজে কথা বার্তা বলা (২) অধিক প্রশ্ন করা এবং (৩) সম্পদ বিনষ্ট করা ।

(মুসলিম শরীফ : হাদীপ নং ১৪৮৬)

সামাজিক মূল্যবোধ

ছালেমা খাতুন *

মানুষ সামাজিক জীব তাই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে চায়। এই সমাজ জীবন শুরু হয় প্রথমত পরিবার থেকে। এভাবে কয়েকটি পরিবার মিলে শুরু হয় সমাজ, এই ছোট ছোট সমাজ মিলে হয় বৃহত্তর সমাজ। আর এই বৃহত্তর সমাজ মিলে হয় গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় মিলিত হয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা। রাষ্ট্রে বসবাস করতে হলে কতগুলি নিয়ম কানুন ও রীতি নীতি মেনে চলতে হয়। এসবই সামাজিকতার আওতায় পড়ে। সমাজে বসবাস করতে হলে নিয়ম কানুন ও রীতি নীতি মেনে চলতে হয়। এসবই সামাজিকতার আওতায় পড়ে। সমাজে বসবাস করতে হলে নিয়ম কানুন ন্যায়নীতি নৈতিকতা মেনে চলা প্রয়োজন হয় সবই সামাজিকতা। এই নিয়মনীতি মেনে চলা শুরু হয় প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকে। বলা যায় সামাজিকতার শিক্ষাদানের কেন্দ্রবিন্দু হলো পরিবার। প্রত্যেক পরিবার আলাদা কতগুলি নিয়মকানুন থাকে। যারা ঐ পরিবারে বসবাস করে তাদের ঐ নিয়মগুলি মেনে চলতে হয়। এরপর যখন বাইরের সমাজে যেতে শুরু করে তখন স্কুল কলেজ, অফিস বা যেকোন প্রতিষ্ঠানে সবখানেই নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এমনকি রাস্তাঘাট বাস-ট্রেন সবখানেই নিয়ম মাফিক মেনে চলতে হয়। সমাজে চলতে গেলে ধাপে ধাপে যা মানতে হয় বা মানা প্রয়োজন সাথে আবার নৈতিকতার ব্যাপার থাকে তাই হলো সামাজিকতা। আচার আচরণ আদব কায়দা সুন্দর স্বাভাবিকভাবে পালন করাও কিন্তু সামাজিকতার আওতায় পড়ে। এর পর আসে ধর্মীয় নিয়ম কানুন ধর্ম পালনের রীতি নীতি সংক্রান্ত ব্যাপার। এসব ধর্মীয় বিধি বিধান সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে মেনে চলাও সামাজিকতার আওতায় পড়ে। ধর্মীয় বিধি বিধান গুলি মেনে চলা অত্যাবশ্যকীয় ও করনীয়। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যেহেতু আমরা সমাজে বসবাস করি, তাই সবকিছুই সমবেতভাবে মেনে চলার চেষ্টা করি। যেমন মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজের ওয়াক্তে নামাজ পড়া, রোজার সময় রোজা রাখা, যাকাত/ফেতরা দেওয়া, গরীব দু:খিদের মাঝে দান খয়রাত করা, সামর্থ্য অনুসারে হজ্জ পালন করা এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি যেহেতু সমাজে বসবাস করি, তাই এগুলিকে সামাজিকতার পর্যায়ে ফেলা যায়। আরো কতগুলি নিয়মকানুন আছে, যেমন- বড়দের সম্মান করা, আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া শুরু করা দরকার যাতে ছোট বেলা থেকেই বুঝতে পারে কোনটা উচিত, কোনটা অন্যায়, কোনটা নিষেধ ইত্যাদি অভ্যাস হয়ে যায়। কথাবার্তার মাধ্যমে অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়, যেমন- ভদ্রভাবে কথা বলা, কটু কথা না বলা, আদব কায়দা রক্ষা করা, ঝগড়া ফ্যাসাদে না যাওয়া ইত্যাদি। বড়দের কিন্তু এ ব্যাপারে দায়িত্ব অনেক বেশী। যেমন যারা দাদা/দাদী, নানা/নানী বা বয়সে বড় আত্মীয় স্বজন আছে তারা কিন্তু এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে ছোটদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা অনেক কিছু জানতে বুঝতে ও পালন করতে শিখবে। ধমক ও শাসনের মাধ্যমে নয়, আদর সোহাগ দিয়েও অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া যায়। বিশেষ করে আমরা যারা এই প্রবাসে বসবাস করি তাদের আরো সচেতন হওয়া দরকার। কারণ এদেশের আর আমাদের সামাজিকতা ধর্মীয় বিধান নীতি নৈতিকতার অনেক কিছুই আছে যা আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য নয়। সেগুলি ছোটদের বোঝানো ও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে নানা সমস্যা অনিয়ম ও অস্থিরতা দেখা যায়। সেজন্য সামাজিক মূল্যবোধকে সবার মধ্যে জাগ্রত ও সমুন্নত করতে হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ দুটি সঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে গ্রহনযোগ্য, নীতি নৈতিকতার দিক থেকে গ্রহনযোগ্য সব কিছুই যাচাই বাছাই করে ভালোকে গ্রহন ও মন্দকে বর্জন করে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে যা সঠিক তাই গ্রহন করাই হলো সামাজিক মূল্যবোধ ও সুষ্ঠু মূল্যায়ন।

স্বপ্নের দেশ আমেরিকা- প্রথম অভিজ্ঞতা

-হারুনুর রশীদ ভূইয়া

স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় আমার প্রথম পদার্পন ছিল এক অজানা উৎকণ্ঠা ও আবেগ তাড়িত মিশ্র অনুভূতিতে ভরা। বিশ্ব বিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনির্ভাসিটির কেনেডি স্কুল অব গভঃমেন্টে ম্যাসন (Mason Fellow) ফেলো হিসেবে পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন এ মাষ্টার্স কোর্সে মার্কিন বৃত্তি নিয়ে যাচ্ছি। ঢাকা থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে লন্ডন হয়ে তৎকালীন টি ডব্লিউ এ (TWA) বিমান যোগে ম্যাসাচুসেটস অঙ্গ রাজ্যের বোষ্টন লোগান এয়ারপোর্ট ১৯৮২ সনের জুনের এক শেষ বিকালে পৌছালে ইউনির্ভাসিটি - নির্বাচিত আমার *হোষ্ট ফ্যামিলি* (Host Family) আমাকে ইউনির্ভাসিটির রিচার্ড হলে পৌছে দিয়ে বিদায় নেন। লম্বা ভ্রমন জনিত ক্লান্তিতে পোষাক বদল না করে বিছানায় এলিয়ে পড়ি। হঠাৎ দরজায় টোকার শব্দে ধড়ফড় করে দরজা খোলার আগেই অত্যন্ত কর্কশ মোটা গলায় শুনতে পাই "পুলিশ, তুমি এখনই এই..... নম্বরে ফোন কর। ওরা তোমাকে খুঁজছে।" আমেরিকার ফোন নম্বর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। ভাবছি এমন কি হলো স্বপ্নের দেশে পা রাখতেই পুলিশের তত্বতালাশ। কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে ফের বিছানায় শরীর ঢেলে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর তখনও বেলা আছে, এসে উপস্থিত হলেন বোষ্টন ইউনির্ভাসিটি পিএইচডি কোর্সের জনাব শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ। সকলের প্রিয় সদা হাস্য, পরপোকারী সকলের প্রতি সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রাখা একজন সাবেক সিএসপি সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর এ ধরণের সুস্বভাবের জন্যে তিনি কমিউনিটিতে ঈর্ষার পাত্র ছিলেন বটে। তাঁর এ অসাধারন গুনের কারণে তাঁরই সহকর্মী প্রাক্তন সিএসপি জনাব সৈয়দ রেজাউল হায়াত যিনি ১৯৭৬ সালে ঢাকার ডেপুটি কমিশনার থাকাকালীন আমি তার অধীনে এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার হিসাবে কাজ করেছি আমাকে ফরিদ ভাই কাছে একটি পোষ্ট কার্ডে আমার বোষ্টন পৌছার দিনক্ষণ জানিয়ে দিতে বলেন। আমি তাই করি। আশায় ছিলাম তিনি এয়ারপোর্টে আসবেন। কিন্তু এয়ারপোর্টে তাকে না দেখে হতাশ হই আর ভাবি একজন সিনিয়র সিএসপি অফিসার কেন এক জুনিয়র অফিসারের জন্যে কষ্ট করে সময় নষ্ট করবেন। প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে এয়ারপোর্টে যাতায়াতে যথেষ্ট সময় প্রয়োজন যা বিদেশের ঐ জীবনে অত্যন্ত দূর্লভ।

ফরিদ ভাই এসেই তার স্বভাব সুলভ স্বস্নেহ ভঙ্গিতে বললেন, "দেশী চলেন ইফতারের সময় হয়ে যাচ্ছে। আমরা দাওয়াতে যাব। আপনার দাওয়াতও নেয়া হয়েছে।" আমার তখনও এয়ারপোর্টে তাঁকে না পাওয়ার অভিমান কাটেনি। জানালাম হলে পৌছার পরপরই পুলিশ এসেছিল। কেন বা কি বলল কিছুই বুঝি নাই। তিনি হেসে জানালেন এয়ারপোর্টে আমাকে না পেয়ে তিনি ভার্সিটির পুলিশকে আমার খোঁজ নিতে বলেছিলেন। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এবার আমার অভিমান দূর হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মেজবানের বাড়িতে ইফতার এর জন্য উপস্থিত হই। এখানে আমি দ্বিতীয় বার ধাক্কা খেলাম। জীবনে কখনও

এমন *প্লেজেন্ট সারপ্রাইজড* হব আশা করিনি। বাড়ীর মালিক সাফোক ইউনির্ভাসিটির ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব এম. রহমান। তিনি আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু এ কে এম শামসুদ্দিন এর বড় ভায়রা ভাই। ১৯৮০ সনের কোন এক সময়ে ঢাকা সফর কালে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় শামসুদ্দিনের বাসায়। তিনি আমাকে কখনো আমেরিকায় গেলে তার আতিথ্য গ্রহনে সৌজন্য আহবান জানান। তাঁকে এজন্য ধন্যবাদ দিলেও মনে মনে ভেবেছি এরকম কত দাওয়াতই তো মানুষ দেয়, তাছাড়া কোন দিন এভাবে আমেরিকায় গিয়ে প্রথম আহার তাও আবার পবিত্র রমজানে তার বাড়িতেই হবে। একেই বলে রিজিক যার মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা যিনি সব জানেন ও বরাদ্দ করেন। এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে আমরা অবগত নই।

ভর্তি হয়ে যথারীতি পড়াশুনা শুরু করলাম। প্রথম দিকে *কালচারাল* পার্থক্যের কারণে ক্লাসে অসুবিধা হতো। টিচার ক্লাসে এলে দাঁড়িয়ে যেতে চাইতাম, তাঁকে স্যার হিসাবে সম্বোধন করতাম। আমি বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাম করা মতলব হাই স্কুল ও ততোধিক তার স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক জনাব ওয়ালি উল্লাহ পাটোয়ারীর আদব-দুরস্থ ছাত্র। কিন্ত এখানে ইউনির্ভাসিটিতে ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষককে বন্ধুর মতো দেখে আর ব্যবহারও তদ্রুপ। তবে একথা সত্য যে, কিছু কিছু শিক্ষক অত্যন্ত রাশভারী ও গুরু গম্ভীর, তাঁদের ক্লাসে কফি, আইসক্রীম খাওয়া সম্পূর্ণ মানা যা ছাত্ররা প্রায়শ করে থাকে। এমনকি অমনোযোগী ছাত্রদের ব্ল্যাক বোর্ডে ডেকে প্রশ্ন উত্তর দিতে বলা হতো। সে এক ভীতিকর পরিবেশ।

আমার কোর্সে বিভিন্ন উন্নয়ণশীল দেশের ছাত্র-ছাত্রী ছিল যাদের সাথে দহরম-মহরমের এক পর্যায়ে আমি জানতে পারি যে, একই সংস্থা ওদের কাউকে আমার চেয়ে বেশি পরিমাণে স্কলারশীপ ও ভাতাদি দিয়ে থাকে। এই *ইনফরমেশন* আমাকে আমেরিকার এক বিশেষ বৈশিষ্ট- "আইন সবার জন্য সমান, *নো ডিসক্রিমিনেশন*" *(No Discrimination)*- এটা পরখ করার সুযোগ করে দিল। যুক্তরাষ্ট্রে "*আই ফিল ডিসক্রিমিনেটেড*" একটি ভয়ংকর অভিযোগ। এখানে কোন প্রকার *ডিসক্রিমিনেশন* গ্রহনযোগ্য নয় বরং আইনের পরিপন্থি। এ ব্যাপারে হার্ভার্ডে পিএইচডি কোর্সের জনাব তৌফিক এলাহী চৌধুরী, প্রাক্তন সিএসপি আমাকে সু-পরামর্শ দিলে আমি এ বিষয়ে যথা স্থানে চিঠি দিয়ে জানাই যে, "*আই ফিল ডিসক্রিমিনেটেড*। আমি মানসিক স্বস্তিতে নেই, পড়াশুনায় পুরো মন দিতে পারছি না, তাই এর সুরাহা আশা করছি।" কিছু দিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ আমাকে অন্যদের সমান স্কলারশীপ ও ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বকেয়া পরিশোধ করে চেক পাঠিয়ে দেন। যুক্তরাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও জাতিগত ভেদাভেদ করা যাবে না। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান-এটা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইনগত ভিত্তির প্রধান উপাদান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এমন দেশ বিরল। আত্মমর্যাদাশীল উন্নত দেশ এর পূর্ব শর্তই হচ্ছে আইনের শাসনের সঠিক বাস্তবায়ন। আইনের শাসন সঠিকভাবে প্রয়োগ আর দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেই সভ্য ও উন্নত জাতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব।

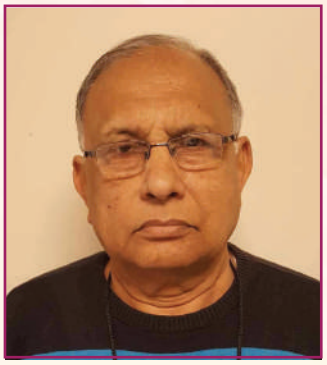

“আমার জীবনের স্মৃতিময় ঘটনার কিছু অংশ।”

হক মোহাম্মদ *

বাবা, মা’য়ের কাছে শুনেছি, আমার জন্ম ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী। বাবা, মা’য়ের হাত ধরে দাঁড়াতে শিখেছি, হাঁটতে শিখেছি, বড় হয়েছি।

মনে পড়ে ৫/৬ বছরে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। তখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তাম। পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত প্রাইমারীতে লেখাপড়া শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি হই। হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনের আমার একটি স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনে আমি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেনীর সামনে যেয়ে ক্লাশ রুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্লাশের ভিতরে উকিঝুকি মারছি। ঠিক এই সময় ঐ ক্লাশে একজন শিক্ষক ঢুকছেন, তিনি পেছন থেকে আমার মাথায় ডাষ্টার দিয়ে হালকা টোকা দিয়ে বললেন,- “তোমাকে রোজ ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, যাও ক্লাশে যাও।” আমিতো স্যারের কথা শুনে অবাক! কারণ আমি আজই এই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমি কি ভাবে রোজ ক্লাশ ফাঁকি দেই? যাহোক, স্যারের নির্দেশে ক্লাশে ঢুকলাম এবং সবার পেছনে একজন ছাত্রের পাশে বসলাম। সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে, কারণ আমিতো নতুন। আস্তে আস্তে স্কুলে স্বাভাবিক হয়ে এলাম।

সম্ভবত: তখন সপ্তম শ্রেনীতে পড়ি। গরমের সময় একদিন আমরা নানা বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আম, কাঁঠালের সময়, আমার নানা বাড়ীতে বেশ অনেক রকমের ফলের গাছ ছিল। দুপুর বেলা সবার অজান্তে আমি লিচু গাছে লিচু পাড়তে উঠেছি। হঠাৎ গাছের ডাল ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেলাম। পাশেই ছিল বড় একটা পুকুর, পড়েছিলাম পুকুরের মধ্যে। সাঁতার জানি না। চিৎকার করতেও পারছিনা। নিশ্চিত মৃত্যু, বিষয়টি আমার নানী দূর থেকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেদিন আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। হয়ত আল্লার হুকুম আর আমার হায়াত ছিল বলেই বেঁচে গিয়েছিলাম।

যখন আমি নবম শ্রেনীতে পড়ি, তখন থেকে বাবার সাইকেলটা নিয়ে আস্তে আস্তে চালাতে শিখলাম। বেশ কয়েক মাস সাইকেল চালান শেখার পর একদিন শহরের মধ্যে বাহাদুরী করে দু’হাত ছেড়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে দূর্ঘটনায় পড়ে বাম হাতটা ভেঙ্গে ফেলি। বেশ কয়েক মাস ভাংগা হাত নিয়ে ভুগেছি। এটাও আমার একটা স্মরনীয় ঘটনা।

১৯৬০ সনের মার্চ মাসে যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাব, তখন প্রথম দিন ভয়ে বাসা থেকে সবাইকে ছালাম করে দোয়া নিয়ে রওয়ানা হওয়ার সময় পা আর চলছে না। তখন বাবা, মা’য়ের উৎসাহে পরীক্ষা দিতে রওয়ানা হলাম এবং ভালভাবে সব পরীক্ষা শেষ করলাম। পাশ করলাম, তারপর শুরু হল লেখা পড়ার নতুন অধ্যায়, কলেজে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করা। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর জানলাম আমার স্কুল জীবনের সহপাঠিরা কলেজে ক্লাশ শুরু হওয়ার প্রথম দিনে প্রায় সবাই ফুলপ্যান্ট ও হাওয়াই সার্ট পরে কলেজে আসছে। তখন আমার মনেও ইচ্ছা জাগলো ফুলপ্যান্ট ও হাওয়াই সার্ট পড়ে কলেজে যেতে। কেননা আমরা স্কুল জীবনে কোনদিন ফুলপ্যান্ট বা হাওয়াই শার্ট পড়তে পারি

নাই। তাই মায়ের কাছে আব্দার করলাম, বাবাকে বলে ফুলপ্যান্ট ও হাওয়াই সার্ট বানিয়ে দিতে। শর্ত সাপেক্ষে বাবা রাজি হলেন। শর্তটি হচ্ছে প্যান্টের ভিতর সার্ট ইন করা যাবে না। আমি রাজি হলাম। প্যান্ট সার্ট পরে একখানা খাতা হাতে করে প্রথম দিন কলেজে যাওয়া সে যে কি উত্তেজনা, শিহরণ, সেটা আজও ভূলতে পারি নাই। ১৯৬৫ সনের আগষ্ট। সেপ্টেম্বর থেকে নিয়মিত কলেজে ক্লাশ শুরু হল। এভাবে প্রায় ৪/৫ মাস রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি।

তখন ইন্টারমিডিয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ফাইনাল পরীক্ষার ৫/৬ দিন আগে কলেজ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে শ্রেনী প্রতিনিধি (রিপ্রেজেনটেটিভ) হিসাবে নির্বাচিত হই। আমরা তখন ভাসানী সাহেবের "ন্যাপের" ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতি করতাম। তখন আমাদের বলা হতো আমরা নাকি বামপন্থী রাজনীতি করি। সে সময় পাকিস্তান আমলের সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগকে পরাজিত করে ভি,পি, জি.এস পদ সহ প্রায় অধিকাংশ পদে ছাত্র ইউনিয়ন বিজয় অর্জন করেছিল।

নির্বাচনের বেশ কিছু দিন পর কলেজে একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্রদের সাথে ছাত্রলীগ ও এন.এস.এফ-এর ছাত্রদের গন্ডড়োল হয় এবং ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে ঐদিন রাতেই কলেজের ২জন শিক্ষক সহ নির্বাচিত ছাত্র সংসদের অধিকাংশই গ্রেফতার হয়ে যায়। আমাদের মোট ১৮জনকে পরের দিন কোর্টে হাজির করে ৮ মাসের ডিটেনশন দিয়ে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি। পরে ছাড়া পেয়ে যশোর সরকারী এম.এম কলেজে ডিগ্রীতে ভর্তি হতে গেলে আমাদেরকে ভর্তি করা হল না। বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হলাম। আমি সহ আমার আরও ৪/৫ জন সহপাঠি নড়াইল ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজে ভর্তি হই। প্রায় ২ বছর মাঝে মধ্যে ক্লাশ করে ১৯৬৯ সনে শেষের দিকে ডিগ্রী পরীক্ষা দেই এবং পাশ করি।

১৯৭০ সনের এপ্রিল/মে মাসের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হই। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হতে খুব একটা প্রতিযোগীতা হতো না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সিট পাওয়া ছিল খুবই সমস্যা। যাহোক অনেক কষ্ট করে ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ২২৯ নং রুমটা বরাদ্ধ করান গেল। জুলাই মাস থেকে ক্লাশ করতে লাগলাম, কিন্তু তখন ৬ দফা আন্দোলন তুঙ্গে। যার কারণে নিয়মিত ক্লাশ হতো না। প্রায়ই মিছিল, মিটিং ইত্যাদি লেগেই থাকতো। এভাবে দেখতে দেখতে ১৯৭১ সনের মার্চ মাস আসল। ২৫শে মার্চের কালো রাত্রের ঘটনা নতুন করে বলার কিছু নেই। সব কিছু তখন উল্টোপাল্টা হয়ে গেলো। সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল। তখন ঢাকা থেকে জীবনটা নিয়ে বহু কষ্টে প্রায় ৪ দিন পর আমার বাড়ী যশোরে পৌঁছলাম। কিন্তু বাড়ীতে কাউকে পেলামনা। পাশের কয়েকটা বাড়ীর পর এক বাড়ীর এক ছেলের মাধ্যমে জানতে পারলাম আমার পরিবারের সবাই গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছেন। পরের দিন আমি গ্রামের বাড়ীতে আমার পরিবারের সহিত মিলিত হলাম। প্রায় ৭/৮ দিন গ্রামে থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় আমি সহ ৬/৭ জন গ্রাম ছেড়ে যশোর হয়ে চৌগাছা থানার মাশিলা বর্ডার দিয়ে প্রায় ৩দিন পরে ভারতের বনগাঁও পৌছালাম।

সেখানে যেয়ে আর এক জীবন শুরু হল। আমি সহ আমাদের যশোর কলেজের অনেক বন্ধুরা শরনার্থী ক্যাম্পে নাম রেজিষ্ট্রি করতে গেলে আমরা যারা ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলাম, তাদেরকে নেওয়া হল না। কারন আমরা ছাত্র লীগ

করি না। তাছাড়া আমরা নাকি বামপন্থী রাজনীতি করি। বহু কষ্টে দিন পার করতে লাগলাম। সে অনেক ঘটনা। জীবন বাঁনোর তাগিদে হোটেলে কাজ করে, সিনেমা হলের টিকিট ব্লাক করে ও রাস্তার পাশে বসে পাকিস্তানী টাকা ভাংগীয়ে ভারতীয় রুপি করে তা দিয়ে কোন রকম বেঁচে ছিলাম। বনগাঁও বাজারের অদূরে বায়ের ব্রীজের কাছে এক বিধবা মহিলার (এক সন্তানের জননী) মাটির বাড়ীর বারান্দায় রাত কাটাতাম। এভাবে দিন পার হতে লাগল। এপ্রিল মাসের ১৪/১৫ তারিখের দিকে আওয়ামী লীগের নেতারা আমাদের প্রস্তাব করলেন যে, ১৭ই এপ্রিলে আমরা যদি মেহেরপুর মহকুমার অদুরে বৈদ্যনাথতলার আম ঝুপরীতে যাই (বর্তমানে মুজিব নগর) তাহলে আমাদেরকে শরনার্থী শিবিরে নাম রেজিষ্ট্রি করবেন। আমরা রাজী হলাম। ১৭ই এপ্রিল ভোরে অনেকের সাথে আমরাও ট্রাকযে-াগে আমঝুপরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সেখানে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ, শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত পরিবেশ। অনুষ্ঠান শেষে সারাদিন না খেয়ে আবার রাত্রে বনগাঁও ফিরে এলাম। পরের দিন আমরা ৫/৬ জন শরনার্থী শিবিরে গেলাম, কিন্তু উনারা আমাদের সাথে বেইমানী করলেন। আমাদেরকে শরনার্থী শিবিরে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হল না। এভাবে প্রায় ৭/৮ মাস বনগাঁও, কলকাতা করে আর ভারতে থাকা সম্ভব হল না। তখন জীবনের ঝুকি নিয়ে যশোর ফিরে এলাম এবং আত্মগোপনে থাকতে লাগলাম। যতই দিন যেতে লাগল ততই দেশের অবস্থা খারপ হতে লাগল। দেখতে দেখতে নভেম্বরের একবারে শেষের দিকে এসে ভারতের সাথে পাকিস্তানের সরা সরি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। চলতে থাকলো যুদ্ধ। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে যশোর মুক্ত হল। একে একে দেশের প্রায় সব অঞ্চলটা মুক্ত হতে লাগল এবং ১৬ই ডিসেম্বর চুড়ান্ত বিজয় অর্জিত হল।

আত্মগোপন থেকে বেরিয়ে বাড়িতে এলাম। তখন সব কিছুই এলোমেলো অবস্থায় বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে যা'রা মারা গেলেন। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আর যাওয়া হল না। কারণ আমি বাড়ীর বড় ছেলে হওয়ায় সংসারের দায়িত্ব আমার উপর পড়ল। ৭২ সনের শেষের দিকে একটা ব্যাংকে চাকুরী জোগার করে ফেললাম। আমার মেজো ভাইও একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করল। দুই ভাই মিলে ছোট ছোট ভাই বোন ও সংসার চালাতে লাগ-লাম। ৭৩ সনের আগষ্ট মাসে বিয়ে করলাম। চাকুরীর সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় চাকুরী করতে হলো। ৯৭ এর দিকে যখন চট্টগ্রামে বদলী করলো তখন পরিবার ছেড়ে দুরে চাকুরী করা সম্ভব হল না। তাই চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে ঠিকাদারী কাজে ঝুকে গেলাম। ৮০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমার মা মারা গেলেন্ ভাই বোন প্রায় সবাই বড় হয়ে বিভিন্ন পেশায় ব্যস্ত হয়ে গেল। তারা বিয়ে করে সংসারী হতে লাগলো। ছোট বোনটিকে বিয়ে দিলাম।

এদিকে বড় ছেলে লেখাপড়া শেষ করে এ্যাকটেল কোম্পানীতে চাকুরী পেল। চাকুরীরত অবস্থায় ২০০৬ সনে ডিভি-তে নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কে চলে আসল। মাঝে অনেক সময় পার হয়েছে। আমার স্ত্রী কঠিন অসুখে ভূগে ২০১১ সনে মারা গেল। আমি আবার একা হয়ে গেলাম। তখন আমার ছেলে আমাকে ইমিগ্রেশন ভিসায় ২০১৩ সনের জুন মাসে নিউইয়র্কে নিয়ে আসল। সেই থেকে আমি এখানে আছি। নামাজ কালাম পড়ে, সিনিয়র সেন্টারে যেয়ে, পত্র পত্রিকা পড়ে বিভিন্ন ভাবে দিন পার করতে হচ্ছে। জানিনা বাকী জীবনটা কিভাবে কাটবে।
৪/৫/২০১৭

একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

কামরুন নাহার *

বেশ অনেক বছর আগের কথা। আমি তখন স্বামী সন্তান সহ বসবাসরত ছিলাম। আমার স্বামী গালফ এয়ার ওয়েজের ডিফেন্স কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

একবার আমরা ইউএই - এর প্রেসিডেন্ট শেখ জায়ীদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান এর মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রন পাই। আামদের দেশের পক্ষে বাংলা দেশের এ্যামবেসেডার জনাব আহমেদ ফরিদ, সিএসপি এবং ফাষ্ট লেভী ম্যাডাম নুজহাত ফরিদ ও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, এ্যামবেসেডার, উচ্চ পদস্থ কর্মচারী এবং গন্য- মান্য ব্যক্তিবর্গ ও শেখ জায়ীদের আত্মীয় স্বজন ও উপস্থিত চিলেন সেই অনুষ্ঠানে।

উৎসবটি ছিল রাতের বেলা। আমরা পৌঁছি দেখি সে এক বিশাল জন সমুদ্র। আরব দেশের ঐতিহ্যবাহী (বোরকা পরিহত) মেয়েদের চুলের নৃত্য এবং সাথে ঢোলের বাদ্য ও বাজতেছিল। পরিবেশকরা হালকা খাবারের বড় বড় থানা হাতে আপ্যায়নে ব্যস্ত এবং সেই সাথে নরম পানীয় ও বিখ্যাত আরব্য 'গাবা' (চা) পরিবেশিত হচ্ছিল। এখানে একটা মজার কথা উল্লেখ না করলেই নয়, আপনি যতক্ষন পর্যন্দ গাবার কাপ উপর করে না রাখবেন ততক্ষন পর্যন্ত পরিবেশ-করা কাপ খালি অবস্থায় থাকতে দিবেন না। এখানে বলা বাহুল্য, গাবার কাপগুলো আকারে ছোট কিন্তু কারু-কার্য খচিত ও সৌন্দয্য মন্ডিত।

বিয়ের অনুষ্ঠান পর্ব চলতেছিল। মহিলা এবং পুরুষ আলাদা - আলাদাভাবে অনুষ্ঠান উপভোগ করতেছিল। এখানে একটি ষ্টেজের বর্ননা না দিলে অনুষ্ঠানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে। কনের বিয়ের ষ্টেজটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছিল সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। সে এক অপরূপ দৃশ্য।

ষ্টেজটি দেখে মনে হচ্ছিল হুবহু সমুদ্রের তলদেশের ছবি। চারিদিকে মনি -মুক্তা, ঝিনুক ছড়িয়ে আছে। স্বচ্চ নীল পানির ভিতরে ছোট ছোট রঙিন মাছগুলো। চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করতেছে, আর কোটি কোটি গাছের ভিতর লকোচু-রি খেলা করতেছে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সবকিছু স্তব্দ হয়ে গেল। আমরা সবাই উদগ্রীব হয়ে ষ্টেজের দিকে তাকাতে লাগলাম। এমন সময় পানির ভিতর থেকে বড় একটা ঝিনুক বের হয়ে এলো। আমরা সবাই অপলক নেত্রে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমন সময় ঝিনুকের মুখটা আস্তে আস্তে ফাক হতে লাগলো। আর একটা পদ্মফুল বের হয়ে পাপড়ি ছড়াতে ছড়াতে প্রস্ফুটিত হতে লাগলো। আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে নি:শাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন পদ্মফুলের কুড়ির মধ্যে বসা মুক্তার মত ঝলমল করে একটি মেয়ে বের হয়ে এলো, সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি আছালামু আলাইকুম বলে সবাইকে অভিবাদন জানালো।

সবাই প্রতি উত্তরে উচ্চ স্বরে মারহাবা, মারহাবা, আলহামদুলিল্লাহ, শোকরান ইয়া - হাবিবী বলে উঠলো।
এমন বিরল দৃশ্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার ভাষা আমার অজানা। এ শুধু উপভোগ করা যায়।

আমেরিকায় আসার প্রথম দিনটি

ফরিদা তালুকদার *

সেই কবেকার কথা, ৩৯ বৎসর আগে এসেছিলাম আমি, মানে আমার আমেরিকায় সেই স্মৃতি এখনও মনে জ্বলজ্বল করে। ভোলা যায়না, সেই ইপ্সিত দিনটিকে চিহ্নিত করলাম।

দিনটি ছিল ১৯৭৭ সনের ৩০শে জুলাই। আমরা এসে পৌছালাম জন.এফ কেনেডী এয়ারপোর্টে। আমি, আমার মেয়ে (বয়স ৪বৎসর ৬ মাস) ও ৩ বৎসরের ছেলে।

প্রথমেই হচকচিয়ে গেলাম বিশাল এয়ারপোর্ট আর বড় বড় প্লেন দেখে। নেমে চারদিকে খুঁজলাম পরিচিত জন পেলামনা কাউকে। কিন্তু এরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল জানতাম না।

সবার মত লাগেজ খুঁজতে গেলাম, দু'টো লাগেজের একটা পেলাম, ১টা হারিয়ে গেছে। ১ জন আমেরিকান মহিলা বলল কমপ্লেন করে যাও, তোমার বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। আমি ভাবলাম হারিয়ে গেলে জিনিষ আবার পাওয়া যায়? এত আজব দেশ। তারপর বাইরে এসে দেখি আমার স্বামী ও ভাসতা দাড়িয়ে আছে। ওদের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভাবীদের এপার্টমেন্টে এলাম। তার ১দিন পরেই দেখি এয়ারপোর্ট থেকে অন্য স্যুটকেসটি মানে লাগেজটি ওরা পৌছে দিয়ে গেছে।

তারপর ১৯৮৩ দেশে গিয়েছিলাম, সেবার ৬টা লাগেজই হারিয়েছিলাম। ২দিন পর সবগুলোই আমাদের এপার্টমেন্টের সামনে পৌছে দিয়ে গেছে।

আমেরিকা সততার দেশ। এখানে চুরি করে কেউ কিছু নেয়না। এমনকি অনেকে দেশ থেকে আসার সময় সুটকেসে তালাচাবিও লাগায় না। কোন জিনিষই কখনও হারায় না। অথচ আমাদের দেশে গেলে লাগেজ বা সুটকেস ভেঙ্গে জিনিষ চুরি। লজ্জিত হই আমাদের দেশের লোকদের আচরণে। কবে তাদের মধ্যে সততা ফিরে আসবে এই চিন্তা করি।

Honesty is the best policy- ছোটবেলায় পড়েছিলাম, চেষ্টা করি সেই জিনিষটাকে পালন করতে। ছোটবেলায় অনেকের সুন্দর পুতুল, খেলনা বা ক্লিপ নিতে ইচ্ছা করত। কিন্তু পারিনি ছোটবেলার সেই শিক্ষা থেকে - 'সততার জীবনের মূলমন্ত্র।'

কবিতা

কি লিখব কি লিখব
কিছুই পাইনে খুজে
অনেক কিছুই ভাবি।
পারি না লিখতে কিছুই বুঝে
সবাই কত লেখালেখি করে
শুধু আমি পারিনা
কিছু লিখতে।
তাই আমি চেষ্টা করছি
একটা কিছু গড়তে
অনেক কিছু চিন্তা ভাবনার পর
লিখলাম এতটুকু।
প্রশংসা করো তোমরা আমার
যদিও করছি কষ্টটুকু
জানি তোমাদের নেই
মোটেও তেমন সময়।
সুখে থাকো, ভালো থাকো
থাকো নিরাময়।

বনভোজন

বেগম সুফিয়া রব

পাঁচ বছর পরে যখন গেলাম আমি দেশে
ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী সবাই দাড়ালো এসে,
কত না হাসি খুশী আমাকে পেয়ে
আমিও আনন্দিত হলাম বাংলাদেশে গিয়ে,
ঢাকা শহরে ছেড়ে যখন গেলাম বরিশালে,
গ্রীন লাইনে টিকিট কাটলাম ফার্স্ট ক্লাশে,
সঙ্গে ছিলো ভাইবোন আরো ছেলে মেয়ে
সকাল বেলা রওনা করে ৫ ঘন্টায় পৌঁছিলাম বরিশালে
দিনের বেলায় নদী পথে যাত্রা দেখতে ভারী চমৎকার
সেকি দৃশ্য আরিয়াল খা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনার
কথোপো কথনের মাঝে স্থীর হল করিবো বনভোজন
বাড়ীতে পৌছানোর পরে করিলাম সেই আয়োজন
৩ নাতি ও ৪ নাতনী আর আমি
বেড়াতে এসেছিলো সাদ, আর ছামি,
জুবানা চুলা বানায়, লাকরী টোকায় মাহিন
দেরী হলেও বাজার নিয়ে এসে পড়লো নুহীন।
শেলী, পলি, মোরগ কাটে, হাফসা বসে মসলা বাটে
অনিকা বসে ধোয় চাল, নিধি দেয় চুলায় জ্বাল
সবাই মিলে মিসে এক সময় রান্না হলো শেষ।
পাটি পেতে আসন নিয়ে কলাপাতায় খাওয়া হল শুরু
হঠাৎ করে মেঘে গর্জন দিলো ডাক গুর গুর
জলদি করে মোরা সবাই খাওয়া কলাম শেষ
রয়ে গেলো সবার মাঝে আনন্দেরই রেশ।।

চাঁদের আলোকে

হাসানুর রহমান

নৈঃশব্দ বিদীর্ণ করে আজো সেই ভাটিয়ালী গানে
বাউল বাতাসে মাঝি গুণ টানে ভাটির সাম্পানে,
বিরহী বৈরাগী তার একমনে বাজায় একতারা।
সনাতন অন্ধকারে আলোকের
ছায়াশ্রিত ঘ্রাণ;
মায়ের বুকের গন্ধে মুখ রেখে
বনানীর সবুজ শিশুরা
(হায়রে অতীত! আজ হারালো কোথায়)
আমার সকল স্মৃতি যন্ত্রনার
আমার সকল সত্বা অতৃপ্ত আত্মার
আমার সকল স্বপ্ন ব্যর্থ প্রত্যাশার।
বিবর্ণ ফ্যাকাশে রঙ;
সমস্ত জীবন জুড়ে সুগভীর শুন্যতার ভাষা।
বনতলে মাঠের বাতাসে
কার যেন বাঁশরীর সকরুণ সুর
আমারে কাঁদায়,
মেঘে মেঘে কানাকানি বেলা চলে যায়;
নিরালা নির্জন বনে ঘুঘু ডাকে
একেলা অচিন।
নিদাঘ দুপুরে পাতা ঝরে,
গাছে লেগে থাকে মায়া।
স্মৃতির পরশ লেগে মায়াময়ী
বিকেলের ঘাসে।
প্রসারিত নারকেল বিথী,
আর্তনাদ উঠে আসে -'ফিরে এসো'
আজো নামে সূর্য্যস্নাত শাশ্বত সকাল,
কপোত - কপোতী শুন্যে মেলে দেয়া ডানা
ছাতিম গাছের ঘু ঘু ডাকে একটানা
এখন আমার কাছে এ পৃথিবী
বিষাদ - মলিন,
আমার স্মৃতির ভারে ক্লান্ত আমি
ব্যথিত চেতনা।
আজো নামে সূর্য্যস্নাত শাশ্বত সকাল,
কপোত - কপোতী শুন্যে মেলে দেয়া ডানা
ছাতিম গাছের ঘু ঘু ডাকে একটানা
এখন আমার কাছে এ পৃথিবী
বিষাদ - মলিন,
আমার স্মৃতির ভারে ক্লান্ত আমি
ব্যথিত চেতনা।
আমার মায়ের মুখ 'শিরি'-র মতন
অন্ধকার শালবনঃ কৃষ্ণপক্ষের রাতে।
মা মনি, যখন তুমি চোখ তোলো, বিরাট আশ্রয়ে
অনেক কেটেছে দিন পালকের মতন বিস্ময়ে;
তোমাকে দেখেছি মাগো ধানভানা কুমারীর মতো
গোলাবী স্বপ্নের জাল বুনে যেতে মায়াবী চোখে।
হোগলার পাশে বসে সেই স্মৃতি আজো হাতড়াই
আমার হৃদয়ে তুমি জেগে থাকো
চাঁদের আলোকে।

ছড়া

রাজিয়া বেগম শানুর *

খোকার চিঠি

রসের হাঁড়ি থাকবে যখন
গাঁয়ের খেজুর গাছে
আমার চিঠি পৌছাবে মাগো
তখন তোমার কাছে।
রসের পিঠে তৈয়ার করে
আমায় ভেবে জানি
অঝোর ধারায় বইছে বুঝি
তোমার চোখে পানি।
জীবন যুদ্ধে লড়তে গিয়ে
হয়েছি খেয়া পাড়
আমায় ভেবে শরীর খারাপ
করেছো কেন আর?
আমার জন্য রসের মিঠাই
রেখো ছিকার হাঁড়িতে
ফাল্গুন মাসে পেলে ছুটি
আসবো দেখ বাড়িতে।

বাদুর

কলা পাতায় ঝুলে বাদুর
পাকা কলা খায়
মিষ্টি মধুর আস্বাদ পেয়ে
নিত্য আসে যায়।
তাইতো সেদিন খেয়ে ধেয়ে
মিষ্টি করে মুখ
বসলো গিয়ে বিদ্যুৎ তারে
পেতে কিছু সুখ।
শুখের তরে বিভোর হয়ে
ঝুলে কাটে কাল
মরা ফাঁদে পা দিয়ে তার
ফসকে গেল হাল।
লাজুক সাহেব
বাইরেতে সাদা সিদে
দেখান বড় লাজ
ভেতরেতে করেন তিনি
বাম হাতের কাজ
প্রতিক্ষায় বসে থাকেন
আসে কখন মক্কেল
টাকা ছাড়া আসলে কেউ
বলেন তিনি বে..আ.. ক্কে..ল।
এতগুলি কাজের মাঝে
কেমনে করি কাজটা
দেখা আবার করবে কিন্তু
বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

দিন বদলের পালা

মাষ্টার মোহাম্মদ

দিনকাল বদল হচ্ছে। বইছে নতুন বাতাস।
পৃথিবী গোলার্ধ এক ঝিলিকের দেখামাত্র।
কোয়ান্টাম গতিসূত্র মানছে প্রতিটি যান্ত্রিক আবহ শাসন
দেহের মৌলিক প্রসেসর পৌঁছে দিচ্ছে রক্ত শিরায় শিরায়।
সেতু বন্ধন সালফার এখন তো ফেসবুক ভালবাসা
অর্থায়নের আরেক নাম জনসংযোগ
যার আষ্টে পৃষ্টেই পাবলিক বাধা।
উন্নয়নের পেছনে খোরাখুরি সময় ব্যয়িত উটকো ঝামেলার
ব্যাংকগুলি তৈল মর্দনে কেবল হাটু গেড়ে বসে থাকে
প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় "নেবেন গো হাড়ি পাতিল মা সকল"।
নতুন আঙ্গিকে ব্যাক্তি উন্নতি ধাচে গড়া।
এখন যে বাড়ছে ফলন..... পরিশ্রমে ব্যস্ত জণগোষ্ঠি
নুড়ি পরছে লাল তুলতুলে লাল শাড়ি
পোষাক তৈরির তুলি নিজের ইচ্ছে প্রকাশই হাতের নাগাল।
ঘুনে ধরা মানবাধিকার পরস্পর তুচ্ছ অভিজ্ঞান
অধিকার আন্দোলন এখন তো আর রাজনীতির দরকার হয় না
ইচ্ছে শক্তি বলে দিতে পারে কবেকার কত শত পাওনা।
আমরা শিখে গেছি ডিজিটাল পদ্ধতির গূঢ় রহস্য যা ছিল একান্ত অজানা
আজ সব জেনে গেছি স্বার্থ হাসিলের বড়ি সেবন পদ্ধতি।
ধানের শীষের ডগায় হাইব্রিড.... মাছেরা একই তালে মেতেছে
সবজি বাগানের নতুন চাষের মেলায় উড়ছে চোখ আলোক সন্ধানে
সহসা মেতেছে অভিযাত্রী পালে ধরছে বায়ু বর্নালী আকাশ।

মোঃ সামছুল হকের
কবিতা

ইতিহাস ও স্বপ্ন

শুনেছি বৃটিশের শাসন
দেখেছি পাকিস্তানের শোষন।
করেছি ছয় দফার আন্দোলন
মাঝে জাতির পিতার ভাষন।
শুরু হলো ইয়াহিয়ার গর্জন
করলাম যুদ্ধ
দেশ হল মুক্ত।
পেলাম তলাবিহীন ঝুড়ি ভিক্ষার
সাথে বাঙ্গালী জাতির উপর ধিক্কার।
জেগে উঠেছে বাষট্টি হাজার গ্রাম
শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম।
গড়তে হবে স্বনির্ভর দেশ
সেইতো আমার সোনার বাংলাদেশ।

প্রবাস জীবন

ছেড়েছি আপন দেশ
বেছে নিয়েছি প্রবাস।
তাই যে বর্তমানে আমেরিকায় বাস।
ঘুচাতে চাই সকল দুখ,
পেতে চাই সুখ
তাই দিবা নিশি করি কাজ
এতে নাহি কোন লাজ
এটাই এখানকার সমাজ।
চাই অর্থ, চাই ধন
আরো চাই হতে আমেরিকান
তাই দিবানিশি ছুটে চলেছি
পাগলা ঘোড়ার মত
নিঃশব্দে নীরবে কাঁদে কেন মন
স্বরণ করি আপন স্বজন
এটাই যে প্রবাসী জীবন।

বাংলাদেশ

সিকদার আঃ রাজ্জাক

বাংলাদেশ
সালাম জানাই
সালাম জানাই আজকে তাঁদের যারা
করলো জীবন দান
সালাম জানাই তাঁদের যারা
রাখলো জাতির মান।
তোমরা যারা বীর সোনালী
দেশের তরে হলে শহীদ
সালাম জানাই আজকে তাদের
ষোল কোটি সন্তান
লড়লে যারা বীরের বেশে
জীবন দিলো হেলায় হেঁসে
সালাম জানাই আজকে তাদের
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রীষ্টান
তাদের স্মৃতি সবার বুকে
তাদের কথা সবার মুখে
সালাম জানাই তাদের যারা
রাখলো জাতির মান

লাখো ছালাম

জহুরা খাতুন

ছালাম ছালাম লাখো ছালাম
তোমাদেরই ছিলাম
তোমাদের জীবনের বিনিময়ে
মোরা স্বাধীনতা পেলাম
আমাদের জীবনের চেয়ে
আমাদের অনেক মূল্য দিলাম
জাতীও তোমাদের কাছে
অনেক অনেক ঋনি
ষোল ডিসেম্বর তোমরা
আমাদের কাছে চীর অমর।

প্রতিজ্ঞা

মোঃ আবদুস সামাদ

রোদ বৃষ্টি বর্ষার দিন
সামনে আসছে রোজার দিন
বাকী আছে ২৭ দিন।
আগে থেকে শপথ নিন।
রোজা রাখবেন ২৯ বা ৩০ দিন
নামাজ পড়বেন প্রতিদিন।
আল্লাহ আমদেরকে তৈফিক দিন।

Bismillah

Wish you a happy birthday

By Md. Abu Taher & Hossain Mokbul
on behalf of the members of Desi Senior Center, Jamaica

Our heartfelt congratulations and
Birthday wishes to Mrs. Nargis Ahmed
On your birthday.

This is the month of the year
You were born
Brightening your mother's lap
Everyone was glad
To see your beautiful face.

Days and months pass and a year later
The birthday again knocks the door
Today you're not getting
The affectionate lap of your mother
Instead, think of us, your well-wishers here.

Let the next year come
To fulfill your wishes
Throwing misfortune to the dust
Life would become beautiful again
We trust!

মিসেস নার্গিস আহমদ এর শুভ জন্মদিনের সাদর সম্ভাষন

তারিখ এপ্রিল ১০, ২০১৭
দেশী সিনিয়র সেন্টারের সদস্যদের পক্ষে
মোহাম্মদ আবু তাহের ও হোসেন মকবুল, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক।

আজকের দিনে যবে জন্মেছিলেন ভবে
আলোকিত করে মায়ের কোল
খুশীর বন্যা হয়তো হয়েছিল বাড়ীতে
দেখিয়া তোমার সেই চাঁদ মুখ।

দিন কাল মাস বছর ঘুরে
জন্মদিন এসেছে আবার দুয়ারে ফিরে
আজ পাবেনাতো সেই মমতার কোল
মনে কর এই পরদেশে আমরাই স্বজন।

কি হবে স্মৃতির বালুকা বেলায় কুঁড়ায়ে ঝিনুক,
কালের গর্ভে যা বিস্মৃত এখন,
শুকনো পাতার মর্মরে শুনিবে সেই বিরহের সুর
জীবনের চাওয়া না পাওয়ার দু:খ বিধুর।

আসুক নব দিগন্তে বিজয়ের বারতা নিয়ে
অতৃপ্তির অস্তিত্বকে ভাগারে ফেলে
জীবন হোক রঙীন তব নতুন বছরে পদার্পনে
সকল চাওয়া পূর্ণ হোক, আশীষ বাণীতে সূধীজনের।

শুভ জন্মদিন

ছালেমা খাতুন *

হে সুন্দরতর সুখময় শুভ জন্মদিন
জীবন যেন হয় ঝলমলে রঙিন
ফুলের নামে নাম তোমার নার্গিস
ফুলের মত বিকোশিত থাকো রইল আশীষ।

EXIT

The Seniors of India Home Desi Senior Center

India Home
A Center for Senior Care

Commitment to Improve the Quality of Life

Desi Senior Center
Mondays, Wednesdays & Thursdays 9AM – 2PM

Jamaica Muslim Center
85-37 168th Street
Jamaica, NY 11432

Senior center programs for 60+ aged older adults: halal lunch, exercise & ESL classes, benefits check up

718-697-9441 / 917-288-7600

www.indiahome.org

indiahomeusa@gmail.com

Our Other Programs:

Every **MONDAY** – 9AM-2PM
Sunnyside Community Services
43-31 39th Street
New York, NY 11104

Every **WEDNESDAY** – 11AM-2PM
Shri Lakshmi Narayan Mandir
128-4 Liberty Avenue
Richmond Hill, NY 11419

Every **THURSDAY** – 10AM-2PM
Queens Community House
80-02 Kew Gardens Road 2nd Fl.
Kew Gardens, NY 11415